PANCHAKOTesSAYS
ISSN: 0976-4968
Vol-15, No.-2, November 2024

বাংলা বানান নির্মাণে ভারতী পত্রিকার ভূমিকা

জয়ন্ত বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়, উখরিদ, খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান, পিনকোডঃ ৭১৩১৪২, পঃ বঃ। ইমেইলঃ jayantabiswasjb79@gmail.com.

সারসংক্ষেপ

বাংলা বানান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে বহুকাল ধরে। তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদের মাধ্যমে বাংলা বানানের গতিপথ এগিয়ে চলেছে। বহুকালের বানান সমস্যার সমাধান আজও পাওয়া যায়নি। কিন্তু বাংলা বানানের সূত্র নির্মাণের জন্য পত্র-পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠান বহুদিন ধরে উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। বাংলা বানানের একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল। এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহে (১৯৩৫)। বানান সূত্র নির্মাণের উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুটি পক্ষ সেই সময় লক্ষ করা গেছে। একপক্ষ, সংরক্ষণশীল পণ্ডিত যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিল আবরণকে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। অপরপক্ষ, অতি প্রগতিবাদী যাঁরা সংস্কৃত বানানের আচ্ছাদন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। দুই পক্ষই ছিল নিজ নিজ অবস্থানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি পেশার মানুষ বাংলা বানানের সূত্র কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন স্তরে। বিশ শতকের শুরু থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পণ্ডিতরা নিজস্ব মতামত ব্যাক্ত করতে শুরু করেছিল। ১৯৩৫ এর পর এই অভিমতের পাল্লা ভারী হতে শুরু করে। বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রার মত ভারতী পত্রিকাতেও বানান নিয়ে কাটাছেড়া শুরু হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা আকাদেমি এবং বাংলা একাডেমীও (ঢাকা) বানান চর্চা শুরু করেছিল। আমরা এই প্রবন্ধে মূলত ভারতী পত্রিকায় বানান বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো নিয়েই আলোচনা করব, দেখানোর চেষ্টা করব যে, ভারতী পত্রিকার লেখক, পণ্ডিতরা বানান নিয়ে কি অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তীকালে বানান সূত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান গুলো সেই অভিমতের কতটা গ্রহণ করেছেন এবং কতটা বর্জন করেছেন।

মূলশব্দ: লিপি, চিত্রবিদ্যা, লিপিবিদ্যা, বাংলা বানান, ভারতী পত্রিকা, উচ্চারণ।

ভূমিকা

বাংলা বানান নিয়ে আমাদের বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার শেষ নেই। এর কারণ প্রধানত দুটি— একদিকে বাংলা বর্ণমালার উচ্চারণের সঙ্গে লিখন পদ্ধতির অসংগতি, অন্যদিকে বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা। অসংগতিগুলো হল প্রথমত, একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণচিহ্ন বা হরফ ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, সমধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জনের আধিক্য। তৃতীয়ত, কোনো কোনো ধ্বনির জন্য প্রয়োজনীয় বর্ণচিহ্ন বা

হরফের অভাব। চতুর্থত, একই হরফের একাধিক রূপের ব্যবহার। পঞ্চমত, তৎসম শব্দ ও অতৎসম শব্দের বানানের নিয়মের পার্থক্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলার প্রধান সমস্যা হল- বানানের ক্ষেত্রে সমতাবিধানের সমস্যা। অর্থাৎ বানানের বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে প্রয়োজন বিকল্প বানানের সম্ভাবনা যথাসম্ভব কমিয়ে বাংলা বানানের সমতাবিধান করা। এই সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। যদিও পূর্বে বহু পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলার শুরু প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুঁথিতে, বাংলা ভাষা লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় থেকে। এরপর নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলা বানানের সমস্যার সমাধান হয়নি। সমতাবিধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা প্রস্তাবিত ওই বানান কাঠামোর নিরঙ্কুশ বিরোধিতা করেন। তাঁরা ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। পুনরায় দুই পক্ষের মতের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রকাশ করেন। তবুও বানানের সমস্যা পুরোপুরি ঘোচেনি। এই ভাবে বাংলা বানানের সমতাবিধানের প্রচেষ্টা সাম্প্রতিকও অব্যাহত রয়েছে। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' সমিতির পক্ষে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - ‘গতির স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে‘ বাংলা বানান আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এ সংক্রান্ত প্রস্তাব করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড বাংলা বানানের সমতা বিধানের একটি নীতিমালা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সর্বমান্য কোনো প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তে এখনো উপনীত হওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক বানান নিয়ে যে বিভ্রান্তি ও অনাচার লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে চলেছে, তার মূলে রয়েছে বানানের নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং নিয়ম জানার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও নিষ্ঠার অভাব। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অনেকাংশে দায়ী। এর উপর বাংলা ভাষা ও বানানের স্বাভাবিক জটিলতা তো রয়েছেই। অন্যান ভাষার মতো বাংলা ভাষা নিজস্ব জটিলতা থেকে মুক্ত নয়। আবার একথা অস্বীকার করা যায় না বাংলা ভাষা বিশ্বের বিজ্ঞানসম্মত ভাষাগুলোর একটি। বানানের জটিলতা থাকলেও তার পেছনে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ভাষাকে শুদ্ধ করে লেখার জন্য নিয়মগুলোকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া, শিখে নেওয়া। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং বাঙালী ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষ। জড়িয়ে আছে ভাষা ব্যবহারের রীতিনীতি।

বানান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে চর্চা দেখা গেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এই সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য কিভাবে পরবর্তী নিয়ম রীতিকে প্রভাবিত করেছে তার অনুসন্ধান জরুরি। দীর্ঘ দিনের মননশীল চিন্তা-চেতনা-যুক্তি-তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে যে বানানবিধি তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সম্পদের অন্যতম উপাদান ভাষা। এই ভাষা প্রকাশিত হয় বানানে। এই বানান সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন আমাদের গবেষণার লক্ষ্য।

উপাদান ও পদ্ধতি

এই গবেষণা নিবন্ধটি তৈরি করতে আমরা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বানান কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলো সংগ্রহ করেছি (নির্বাচিত)। আলোচনা উঠে এসেছে মূলত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে।এছাড়া প্রাবন্ধিকদের বাংলা বানান নির্মাণের ভাবনা ব্যাকরণগত (Grammatical) বা ঐতিহাসিক (Historical) মানদণ্ডে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে।

ফলাফল

প্রাবন্ধিকদের অভিমত পরবর্তী বাংলা বানান নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা গ্রহণ করেছে এবং কোন যুক্তিতে গ্রহণ করেছে তা উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি যে অভিমতগুলো বর্ণিত হয়েছে তারও উল্লেখ থাকবে আলোচনা অংশে ।

আলোচনা

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩১৮-এর ভারতীর শ্রাবণ সংখ্যায় লিপিবিদ্যা সম্পর্কে বিষদভাবে আলোচনা করেছেন। লিপি বানান চর্চার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে ‘Speech is silver, silence golden’. আমাদের ভাষায়—‘শতং বদ, মা লিখ’। প্রবাদ দুটিতে বাক্ সংযমের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় ‘কথার ফটোই হল লেখা বা লিপি‘। মনের ভাব বা প্রাণের কথা প্রকাশ করার প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। শব্দ শ্রুতিগোচর হলেও মনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। শব্দের সঙ্গে বিজড়িত ভাবই হল শব্দের অর্থ। শব্দের দ্বারা বক্তার মনের ভাব শ্রোতার মনে বাহিত হয়। শব্দ দ্বারা বাহিত অর্থ বা চিত্র বা ফটো মনোনয়নের সামনে উদিত হয়। ইংরাজিতে তাকে Imagination বলে। কারণ ‘গোলাপ' নামটা শোনা মাত্রই একটি চিত্র বা image মনোচক্ষুর সামনে ভেসে ওঠে। নামটি শোনামাত্রই ওই বস্তু সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা করতে পারি। অর্থাৎ লেখা বা লিপি আবার এই উচ্চারিত শব্দের ফটো বা চিত্র।

এই লিপি বা ফটো আবার নানা জাতীয় হয়। এখানে নানা জাতীয় বলতে বিভিন্ন ভাষার কথা তিনি বলতে চাইছেন না। যেমন বক্তৃতা লিপির জন্য short hand writing-এর মতো অভিনব লিপি প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। টেলিগ্রাফের মেশিন আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণ করতে পারে না। ভাষার উচ্চারিত শব্দের অক্ষুন্ন ফটো চিত্রিত হয় গ্রামোফোন রেকর্ডে। তাই এর নাম রেকর্ড বা লিপি। অর্থাৎ তিনি দেখিয়েছেন যে লেখনী ছাড়াও আরো অনেক রকম লিপি আছে, যার সাহায্যে আমরা ভাষার ফটো অঙ্কন করি। আরেক প্রকার লিপি হল চিত্র। যার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, যা কৃত্রিম ভাষা নয়— জীবন্ত ভাষা।

লিপিবিদ্যার প্রথম স্তর চিত্রবিদ্যা। বিনা বর্ণ বিশ্লেষণে আধুনিক যুগের লিখন প্রকাশ হয়নি। এক-একটা অর্থ প্রকাশক শব্দই ভাষার উচ্চারণকালের একক বা unit স্থানীয়। শিশু যখন কথা বলে তখন বর্ণ বিশ্লেষণ না শিখে উচ্চারণ আয়ত্ত করে এবং জল, রুপ, জন- জ জ প্রভৃতি উচ্চারণ করতে শেখে। পরে লিপিবিদ্যার সঙ্গে পরিচয় হলে বর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা এক একটি শব্দের বানান বা বর্ণ সংযোজন করে থাকে। অর্থাৎ লিপি শিক্ষার আগে পর্যন্ত বর্ণ বিশ্লেষণের কথা ভাবা সম্ভব, কারণ বর্ণ বিশ্লেষণ ব্যাপারটি abstraction বা ভাবনিষ্পর্য সাপেক্ষ। লিপিবিদ্যা ছাড়াও অঞ্চনবিদ্যা, অঙ্গভঙ্গি বা সাংকেতিক ভাষা প্রকাশ, রজ্জুলিপি বা কুইপুলিপি, ভাবলিপি ইত্যাদি লিপির প্রয়োগ আছে। ভাবলিপি বা ideography-এর সাহায্যে এক একটি শব্দগ্রাহ্য ভাব এক একটি চিহ্ন দ্বারা লিপিবন্ধ হয়। চিত্রলিপি বা রজ্জুলিপি যেমন ভাব-প্রকাশক বাক্য বা sentence-এর প্রতিলিপির একক বা unit স্থানীয়। ভাবলিপি বা ideography-এর সাহায্যে একটি বাক্য বা sentence কয়েকটি চিহ্ন বা symbol একত্রে প্রয়োগ করতে হয়। চিত্রলিপি অপেক্ষা ভাবলিপি অনেক উন্নত। কারণ ভাবলিপি বা ideography থেকেই বর্ণমালার উৎপত্তি।

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে যে সব বর্ণমালামূলক লিপির আবিষ্কার হয়েছে। তার উল্লেখ করেছেন—

১। ভাব-প্রকাশক লিপি:

১.১. সমগ্র বাক্যের চিত্র-আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ।

১.২. এক একটি শব্দগ্রাহ্য ভাবের চিত্র (ideograms বা ভাবলিপি – মেক্সিকো বাসীগণ, চীনের প্রাচীন অধিবাসীগণ ও আদিম মিশরবাসীগণ)।

২। ধ্বনি প্রকাশক লিপি:

২.১. শব্দলিপি বা Phonograms (এক চিত্রের দ্বারা বহু সমোচ্চারণ শব্দের লিখন - চীনের আধুনিক লিপি, প্রাচীন মিশরের লিপি)

২.২. অক্ষর বা Syllable লিখবার প্রণালী—জাপানি ও সেমিটিক বারুলিপি (cunciformes)

২.৩. বর্ণমালামূলক লিপি (সম্পূর্ণ বর্ণবিশ্লেষণ হয়নি, সমগ্র শব্দের ধ্বনিবাচক। লিপির প্রথম অক্ষরের উচ্চারণের ব্যবহার, ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্র লিপিবদ্ধ, স্বরবর্ণ বিশ্লেষণ হয়নি) সেমেটিক, মিশরের লিপি এই স্থানে এসে ক্ষ্যান্ত হয়। পরবর্তী প্রণালীতে উন্নত হয়েছিল।

২.৪. বিশুদ্ধ বর্ণমালামূলক লিখন-প্রণালী (প্রত্যেক বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন), গ্রিস ও ইতালি দেশে উত্তরকালে মিশর দেশে ও পারস্য দেশের বক্রলিপিতে।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাবেই লিপিবিদ্যার বিশ্লেষণ করেছেন। যা আমাদের পরবর্তী বানানচর্চায় পাথেয় হয়ে উঠেছে।

অবনীমোহন চক্রবর্তী 'বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধে বাংলা বর্ণমালার সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে বর্ণমালার 'আ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত বর্ণগুলোকে ভাষা থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন ইংরাজিতে A,E,I,O,U দ্বারা স্বরের কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা এর দুটো রূপকে গ্রহণ করেছি। একটা স্বরূপ, আরেকটা Symbol বা সংকেত। প্রাবন্ধিকের মতে, কার চিহ্ন দিয়ে আমাদের উপকার তো হয়নি, বরং গোটা কয়েক বর্ণের বোঝা বাড়ানো হয়েছে মাত্র। এর যেকোনো একপ্রস্থ বাদ দিলে অনায়াসে কাজ চালানো যায়। তাঁর ধারণা ভাষায় বর্ণগুলোকে যত কমানো যায় ততই ভালো। প্রথমেই বলে রাখা ভালো অবনীমোহন চক্রবর্তীর এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে বাংলা বানানের সূত্র নির্মাণে গৃহীত হয়নি। ইংরাজির ন্যায় বাংলায় স্বরের একরূপ বাদ দেওয়াকে বর্তমান বানানবিধিতে এমনকি বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা এই প্রস্তাবকে গ্রহণ জানাননি।

তিনি সংকেতের কথাই এখানে বলেছেন। তাঁর মতে 'অ' বর্ণের ক্ষেত্রে কোনো রূপ সংকেতের ব্যবহার চলে না। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন 'অ' যেমনি আছে, তেমনি থাকুক। না হলে—নতুন Symbol সৃষ্টি করা হোক। অন্যান্য স্বরের ক্ষেত্রে Symbol কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন—'বে আমন' শব্দটিকে Symbol দিয়ে লিখলে লিখতে হয়—' বে ামল'। অনুরূপভাবে এটা কে ‘ েটা', 'ইন্দ্র' কে ' িন্দ্র' লিখতে হয়। তিনি এই সমস্ত শব্দের

Symbol-এর ব্যবহারে যে একটা মুশকিল আছে তা স্বীকার করে নিয়েও, একটা পথ বাতলেছেন। সেটা হল এক্ষেত্রে তিনি ইংরাজি হাইফেন (-)এর মতো চিহ্ন ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। যেমন— 'তেইশ' শব্দটি Symbol দিয়ে লেখা হবে 'তে-শ', অর্থাৎ এই চিত্র দিয়ে 'তে-শ'র গোলমাল থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। শব্দগুলো যথাক্রমে বে-আমল (বে -আমল), বাজাও (বাজা -ও), তাই (তা-ই), এত (এ-ত), মুহূর্তেই (মুহূর্তে-ই), এবং (এ-বং), এ (এ-), হইয়া (হ-ই-য়া), তাহাই (তাহা-ই), এই (এ-ই), আজিও (আজি-ও) ইত্যাদি। বলাবাহুল্য অবনীমোহন চক্রবর্তীর এই প্রস্তাব পরবর্তী বানানবিধিতে প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ এই প্রস্তাব সুধীজন মেনে নেননি।

ভারতীর মাঘ সংখ্যায় (১৩২৮) অবনীমোহন চক্রবর্তীর 'বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে প্রস্তাব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই প্রবন্ধের উত্তর স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঙলা ভাষার বর্ণ প্রবন্ধটি রচনা করেন। অবনীমোহন চক্রবর্তী বাংলা বর্ণমালা থেকে কিছু বর্ণ বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্ণ বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে মত দিয়ে বলেছেন— "বর্ণগুলিকে বাদ দিয়ে তিনি যে উদ্ভটতার সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে বাংলা ভাষার গোলমাল ভিন্ন উন্নতির কোন দিকই লক্ষিত হয় না।" তিনি এই পরিবর্তনের বিপক্ষে তা স্পষ্ট। তিনি মনে করেন ঐতিহ্যকে ভুলে যাওয়া বিদেশিদের কাজ, সেটা আমাদের পক্ষে খুব একটা সুখকর হবে না। তবে অবনীমোহন চক্রবর্তীর পরিবর্তনের ধারণা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে মান্যতা না পেলেও, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের না পরিবর্তনের ভাবনা আজকের দিনে গৃহীত হয়নি। বলাবাহুল্য প্রাবন্ধিকের এই প্রস্তাবটিও বর্তমান বানানবিধি বা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে মান্যতা পায়নি।

উপসংহার

পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষারই সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব উক্ত ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন। সমস্যার সংকট বিতর্ক অনিয়ম সবকিছুকেই সেই প্রতিষ্ঠান যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত করে। বাংলা ভাষা দীর্ঘকালের সাহিত্য, সংস্কৃতির, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হলেও তার সর্বজন স্বীকৃত সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের সর্বজনমান্য হয়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষার প্রথম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এরপর একে একে বাংলা আকাডেমি ও বাংলা একাডেমী (ঢাকা) বানানবিধি রচনায় গঠনমূলক ভূমিকা নিয়েছে।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বাংলা আকাদেমির বানানবিধি মান্যতা পেয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্মিত সূত্রগুলি ব্যক্তি অভিমতের যুক্তি-অযুক্তির বিচারে গ্রহণীয় হয়েছে। এখানে 'ভারতী' পত্রিকার বানান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না।

প্রাবন্ধিকদের বানান সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক, বাস্তব যুক্তি পরবর্তীকালের বানান প্রতিষ্ঠান গুলো কিছুটা গ্রহণ করেছে, কিছুটা বর্জন করেছে। আমরা এই প্রবন্ধে মূলত ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বানান কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলি, বলা ভালো অভিমতগুলো পরবর্তী বানানবিধি রচনার ক্ষেত্রে কতটা গ্রহণীয় হয়েছে আর কতটা গ্রহণীয় হয়নি, সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনীমোহন চক্রবর্তীর ভাবনা পরবর্তী বানানবিধিতে কার্যকরী না হয়ে উঠলেও, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক যুক্তি, বাস্তব চিন্তা পরবর্তী বানানবিধিতে অনেকখানি প্রভাব ফেলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ : লিপিবিদ্যা, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতী, শ্রাবণ, ৪৫ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (১৯২১ খ্রি.), পৃ. ২৬৩-২৭৬

২. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ : 'বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব', অবনীমোহন চক্রবর্তী, ভারতী, মাঘ,১৩২৮ বঙ্গাব্দ (১৯২১ খ্রি.), পৃ. ৯১৭-৯১৯

৩. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ : 'বাঙলা ভাষার বর্ণ', রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভারতী, ফাল্গুন, ৪৩ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (১৯২১ খ্রি.), পৃ. ১০৫৩-১০৫৪